IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

না-নারী, না-পুরুষ— সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয় সত্তার এক দ্বান্দ্বিক অবস্থান

Dr. Gurupada Adhikari
Assistant Professor
Michael Madhusudan Memorial College
Kabiguru Sarani, City Centre, Durgapur-713216

সংক্ষিপ্তসার

ট্রান্সজেণ্ডার বা রূপান্তরকামী মানুষরা সমাজে চিহ্নিত হবার পর থেকেই তাদের জীবনে নেমে আসে সুকঠিন বঞ্চনা। তাদের পাড়াপড়শি, আত্মীয় স্বজন এমনকি বাড়ির মানুষদের কাছেও তারা হয়ে ওঠে অবহেলার শিকার। বেঁচে থাকার এক কঠিন প্রতিকূলতার মুখোমুখি এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ নিজের আইডেন্টিটি খুঁজতে মরিয়া হয়ে ওঠে। নিতান্ত নিরুপায় জীবনে তারা বেছে নিতে বাধ্য হয় হিজড়ার পেশা। নাচগান, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বাসে ট্রেনে জোরজুলুম করে পয়সা আদায়, দেহব্যবসা অথবা অসদুপায়ের মাধ্যমে তারা অর্থ রোজগার করতে বাধ্য হয়। বেঁচে থাকার এ এক কঠিন লড়াই। সাহিত্য ও সমাজে তাদের সেই দ্বান্দ্বিক অবস্থান নিয়েই আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ।

সংকেত শব্দ

সামাজিক ডিসক্রিমিনেশন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য, রূপান্তরকামী নারী, সংসার, অন্তঃসত্ত্বা, যৌনতা, নারীজীবন, পৌরুষ, হিজড়া।

মূল প্রবন্ধ

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মেয়ে ঝিনুক। ছোটো থেকেই মসজিদে নামাজ পড়া, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট খেলা এসবেই সে ছিল আসক্ত। মেয়েদের পোশাক কখনো সে পছন্দ করেনি। স্কুল থেকে কলেজে এলেও মেয়ে বন্ধুই ভালো লাগত। এভাবেই ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে চার বছর ধরে চলে প্রেম। তখনো সে শারীরিকভাবে মেয়ে। সব বুঝতে পেরে প্রেমিকা বেঁকে বসে। হতাশা থেকে আসে অবসাদ। বাধ্য হয়েই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় সে। ২০২১ সালে ভারত থেকে সার্জারি হয়, পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে অস্ত্রোপচার। নারী থেকে সে পুরুষে পরিণত হয়। সকলের কাছে সে আর ঝিনুক নয়, আজ সে জিবরান।[১]

এবার আসি এক রূপান্তরকামী নারী রাজকুমার দাসের প্রসঙ্গে[২]। হুগলি মহসিন কলেজ ও ইণ্ডিয়ান আকাদেমি অফ সোশ্যাল সায়েন্স (পশ্চিমবঙ্গ শাখা) আয়োজিত ২০০২ সালে দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ সমাজ বিজ্ঞান কংগ্রেসের 'অন্তেবাসী: জাতি ও ধর্ম সংস্কৃতি' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সে জানিয়েছে, তার ব্যক্তিজীবনের নানা অজ্ঞাত তথ্যের কথা। শারীরিকভাবে একজন পুরুষ হয়েও মনের দিক থেকে সে ছিল নারী, বেছে নিয়েছিল নারীর পোশাক। ছোটো থেকেই নাচের প্রতি ছিল তার অসম্ভব মুগ্ধতা। তার মা তাকে ছেলেবেলায় নাচের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। এর ফলে মেয়েলি পোশাক-পরিচ্ছদ বা সাজগোজের প্রতি তার তীব্র অবচেতন আকর্ষণ একটু একটু করে পূর্ণ হয়েছে। ক্রমে ক্রমে পুরুষ সমাজে সে হয়ে পড়েছে একেবারেই বেখাপ্পা। তার নারীসুলভ আচরণকে সমাজ মেনে নেয়নি। এইজন্য স্কুলে ক্রমাগত 'লেডিজ', 'বৌদি', 'মেয়েন্যাকড়া', 'ছক্কা' ইত্যাদি নানা কটু কথা শুনতে হয়েছে। বাস বা ট্রামে প্রতিদিন উপলব্ধি করেছে সুস্থ সমাজের নাসিকা ও ভ্রু-কুঞ্চন আর দূরত্বপূর্ণ অবস্থান। এই সামাজিক ডিসক্রিমিনেশনের কারণে তার

নির্দিষ্ট কোনো বন্ধুবান্ধব তৈরি হয়নি। প্রতিমুহূর্তে সে অনুভব করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভয়ঙ্কর আধিপত্য। প্রতিবন্ধকতা আর দূরত্বের কারণে সে বাধ্য হয়েছে নিজের শরীরে লৈঙ্গিক রূপান্তরের একক সিদ্ধান্ত নিতে। মনোচিকিৎসকের পরামর্শ মেনে প্রথমদিকে পুরুষ হরমোন ব্লক করে ফিমেল হরমোন বা ইস্ট্রোজেন বাড়ানো হয়েছে তার শরীরে। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে সে হরমোন ট্রিটমেন্ট করিয়েছে। এরপর কাউকে না বলে সে নার্সিংহোমে সার্জারি করিয়েছে। রূপান্তরকামী রাজকুমার এভাবেই নিজের নবজন্ম লাভ করেছে।

রূপান্তরকামী পুরুষ বা নারীর কোনো সামাজিক Identity থাকে না। কেননা, সে না-নারী, না-পুরুষ— দুইয়ের নিচে তার অবস্থান। বস্তুতপক্ষে সমাজের মূলস্রোতের বাইরে তার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এভাবেই বঞ্চনা থেকেই তাদের একটা আলাদা সমাজ তৈরি হয়। আর তখন জীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে তারা হিজড়ে পেশায় আত্মসমর্পণ করে। কবিতা সিংহের 'পৌরুষ' উপন্যাসে হিজড়ে সম্প্রদায়ের এক স্বতন্ত্র স্বর মুখ্য হয়ে উঠেছে। যৌনতার নানা অবচেতন অধ্যায়, নানা মনস্তাত্ত্বিক পর্ব এই উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যে এর আগে না-নর, না-নারী সম্প্রদায়ের অন্তর্মানসের ছবি এত স্পষ্টভাবে কোনো লেখকের হাতে প্রতীয়মান হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সখীসোনা যৌন প্রতিবন্ধী। সে অশিক্ষিতা, তার অবচেতন মানসে প্রেম, সন্তানের প্রতিচ্ছবি। লক্ষ্মণের সঙ্গে তার সংসার গড়া হয়ে ওঠেনি। জীবনজুড়ে তার ঘোর অতৃপ্তি। অন্তঃসত্ত্বা প্রতিবেশী সুমতির ফোলা পেটটার দিকে তাকিয়ে তার ভেতরে জেগে উঠেছে অপূর্ণতাবোধ। তার অস্তিত্বের সংকট কবিতা সিংহর লেখায় বেদনাত্মক রূপলাভ করেছে:

> "ধন্য মেয়ে মানুষ। সখীসোনা সুমতির সেই ভেঙে আসা ফোলা পেটটার দিকে চোখ রেখে পেছু হটতে লাগলো। না-না ওই বাচ্চার আটকড়াই এ সে ঢোলক বাজিয়ে নাচতে পারবে না। ... পিছন ফিরে পাগলের মতো ছুটতে লাগল সখীসোনা। সে মেয়েছেলের থেকে পালাচ্ছে। গর্ভবতী মায়ের কাছ থেকে পালাচ্ছে — সে স্বভাবের থেকে পালাচ্ছে — সে মানুষের সংসার থেকে পালাচ্ছে — তার হয়ে গেল। কোথায় তার কমতি, কোথায় তার খাঁকতি সে ধরতে পারছে"।[৩]

সখীসোনা না- নারী, না-পুরুষ। সরলা এক পরিপূর্ণ মানুষ। তাই সে সরলার ভাগ্যকে সাধুবাদ জানিয়েছে। কিন্তু সে জানে না সরলা নারী হলেও বিধবা। সে মা হতে পারেনি। মৃত স্বামী বিজয়ের স্মৃতি তাকে কাতর করে তোলে। সখীসোনার প্রশস্তিবাক্য সরলার জরায়ুতে গিয়ে বেঁধে। সরলার যৌন হাহাকার আর সখীসোনার জীবনের বিচ্যুতি কখনোই এক হতে পারে না। সখীসোনা লক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পক্ষে দেহ মিলন সম্ভব নয়। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে সে দেখেছে লিঙ্গের অনিবার্য ক্রিয়াবিন্যাস। তীব্র অতৃপ্তি তাকে পীড়িত করেছে :

> "ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসতে থাকা শরীরের বাঁধন আর চিন্তা নিতে পারছিল না। সখীসোনা তাই ছবি দেখতে লাগলো, সেই অদ্‌ভুত সব ছবি; হামান দিস্তায় পান ছেঁচছে কেউ, জাঁতা ঘুরছে গমগুঁড়ো করার জন্যে, কাঠ কাটছে মস্ত করাত, লম্বা রেলগাড়ি ছুটে ঢুকছে অন্ধকার টানেলের ভিতর — এ সব ছবিই সৃষ্টির, এ সব ক্রিয়াই-সুস্থ সবল যোনি আর লিঙ্গের সৃজনের প্রতীক"।[৪]

সখীসোনা গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে চেয়েছিল। লক্ষ্মণের সঙ্গে সে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল।

> "আমি ফিরে যাবো, ঠিক ফিরে যাবো। যেখানে মেয়ে আছে, পুরুষ আছে, বাচ্ছা আছে, বুড়ো আছে। সেই স্বাভাবিক মানুষের সংসারে ফিরে যাবো। আমার বিয়ে হবে, স্বামী হবে, সংসার হবে, বাচ্চা কাচ্চা হবে। আমি তাদের নিয়ে সুখে ঘরকন্না করব।"[৫]

স্বামী, সন্তানের প্রতি তার আকুলতা, মাতৃত্বের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে গুজরাটে প্রত্যন্ত দেবতার মন্দিরে। কিন্তু বিয়ে করেও নিজের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সে সচেতন, "আমারে বেট্যাছিলারা বউ এর মতো রাখব্যে না। বউ এর শক্তি নেই আমার। বউকে লুক্যে সুজ্যা সুজ্যি পায়, আমাকে উল্টা কর্‌্যা নিব্যে।"[৬] তার মধ্যে লিঙ্গের কোনো সত্তা প্রকট হয়ে ওঠেনি। তবু সে বিবাহ করতে চেয়েছে, সংসার করতে চেয়েছে। ট্রান্স নারীদের এ অতি স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। সমাজের মূলস্রোতে থাকা পুরুষ সম্প্রদায় হিজড়েদের সঙ্গে যে পায়ুসঙ্গম করে এই সহজ সত্য সম্পর্কে সে সচেতন। গোষ্ঠীর সদস্যা হিজড়া তাকে জানিয়েছে শরীর লুকিয়ে বিয়ে দিলেও একদিন সে ধরা পড়বেই। সেদিন তার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করবে। সংসারবিচ্ছিন্না সখীসোনাদের জীবনে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে না পারার এ এক তীব্র ট্র্যাজেডি। যেহেতু নির্দিষ্ট লিঙ্গচিহ্নহীন মানুষের কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় এই সভ্য সমাজ স্বীকার করে না। তাদের মধ্যে তৈরি হয় আইডেন্টিটি ক্রাইসিস বা জেন্ডার ক্রাইসিস। এভাবেই সামাজিক স্বাভাবিক পরিচিতির বাইরে একটা ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বন্দি হয়ে পড়ে তার স্বাভাবিক মানবিক সত্তা আর ব্যক্তিগত অধিকারবোধ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে আলকাপ দলে

দো-আঁশলা পুরুষ শান্তিকে নিয়ে কাহিনির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিরোধ। কঠিন এদের জীবনযন্ত্রণা। তাকে মঞ্চে মোহিনী নারীর মায়ায় পুরুষদের মন ভোলাতে হয়, শিখতে হয় নানা ঠাট-ঠমক, কিন্তু সাজঘরে তাকে নিয়ে চলে দেহের বেসাতি। নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা এরা বিস্মৃত হয়। এদের মধ্যে না জেগে ওঠে পৌরুষ, আর না প্রকাশ পায় নারীত্ব। এভাবেই তারা একটা সামাজিক কমিউনিটি তৈরি করে যেটাকে বলা হয় গেটোআইজেশন (ghettoisation)।

লিঙ্গ সংক্রান্ত স্বাভাবিক শ্রেণি বিভাজনের বাইরে তৃতীয় লিঙ্গের অস্তিত্ব প্রাচীন যুগ থেকেই দেখা গেছে। রামায়ণে বৃহন্নলাদের দেখা দেখা গেছে। বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করেছে, হর-পার্বতীর মধ্যেও অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখা যায়। সেখানে শিখণ্ডী পুরুষের মর্যাদা পেয়েছিল, আবার দৈব অভিশাপে রাজা বুধ নারী হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যেও দেখি, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে চিত্রাঙ্গদার মধ্যে গড়ে উঠেছিল পুরুষালিতা। মদন দেবতার কাছে সে অকপটে জানিয়েছে তার আত্মপরিচিতি:

"তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে,
ফিরি স্বেচ্ছামতে; নাহি জানি লজ্জা ভয়,
অন্তঃপুরবাস; নাহি জানি হাবভাব,
বিলাস-চাতুরী; শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।"[৭]

প্রথম পুরুষ অর্জুনকে দেখার পর নিজের নারীত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে চিত্রাঙ্গদা। সাহিত্যে বারবার এই তৃতীয় সত্তার কথা উঠে এসেছে। সমকামিতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে নবনীতা দেবসেনের লেখা 'বামাবোধিনী' উপন্যাসে। সেখানে সঞ্জয় আর রবি —সমকামী সম্পর্কের দুই পুরুষ। তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক ধরনের মানসিক সম্পর্ক। পরস্পর সহবাস করে তারা জীবনে সুখভোগ করে। প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মকে তারা লঙ্ঘন করে। সামাজিক সম্মতির অভাবে সত্য গোপন করে তাদের বাঁচতে হয়। নৈরাশ্যের মধ্যেও তারা আনন্দ অনুভব করে। সমকামিতা প্রসঙ্গে 'ভারতের হিজড়ে সমাজ' গ্রন্থের 'যৌনজীবন' অধ্যায়ে বলা হয়েছে:

> "সমলিঙ্গের মানুষ যখন একে অপরের দেহ উপভোগ করে, তখন তাকে সমকামিতা (homosexuality) বলে। অর্থাৎ, পুরুষ-পুরুষে উপগত নয়, নারী-নারীতে। হিজড়ে দুনিয়ায় যে সমকামিতার (homosexuality) সন্ধান আমরা পাই, তাকে পুং সমকামিতা (male-homosexuality) বলা যেতে পারে। এই যৌনক্রিয়ায় দুই পুরুষকে দুই নামে চিহ্নিত করা হয়। একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী (active agent) এবং অপরজন নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণকারী (passive agent)। নিষ্ক্রিয়ের ভূমিকায় যারা থাকে, তারা মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ। চলনে-বলনে তাদের মধ্যে নারীত্বের ছাপ ফুটে ওঠে। সুশ্রী পুরুষকে দেখলে তাদের মধ্যে সুপ্ত যৌনকামনা জেগে ওঠে। পায়ুকামে (sodomy) তারা যৌনতৃপ্তি বোধ করে। এমনকী তারা অন্য পুরুষের পুরুষাঙ্গ লেহন করে থাকে' (mouth-genital contact)।"[৮]

তৃতীয় সত্তা বা তৃতীয় লিঙ্গ নিয়ে বাংলায় তেমন কোনো প্রতিশব্দ নেই। হিজড়া, বৃহন্নলা, কিন্নর ইত্যাদি শব্দ বাংলায় বহুকাল থেকেই প্রচলিত। সেইকারণে তৃতীয় সত্তা বা হিজড়ে ব্যাপারটা নিয়ে সুস্থ মধ্যবিত্তের ধারণার ইতরবিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইংরাজিতে এদের নিয়ে বর্তমানে LGBTQIA+ শব্দবন্ধটির বহুল প্রচলন আছে। যেখানে প্রতিটি শব্দের আলাদা আলাদা তাৎপর্য আছে। 'L' অর্থে Lesbian- নারীর প্রতি নারীর ভালোবাসা। 'G' অর্থে Gay – পুরুষের প্রতি পুরুষের ভালোবাসা। 'B' অর্থে Bisexual- উভয় লিঙ্গের প্রতি ভালোলাগা। 'T' অর্থে Transgender- শরীর ও আত্মা যাদের অভিন্ন নয়। 'Q'- Queer or questioning Individuals. এটা একধরনের umbrella term, যা নানা ধরনের যৌন প্রতিবন্ধকতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'I' অর্থে Intersex- জন্মগতভাবে তাদের শরীরে দুটো অঙ্গই আছে, বা কোনোটাই নেই। 'A' অর্থে Asexual শারীরিকভাবে কোনো লিঙ্গের প্রতি যাদের কোনো আকর্ষণ নেই।

সমকাম, উভকাম, বিষমকাম ও রূপান্তরকামিতার প্রসঙ্গ নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন আবুল বাশার। উপন্যাসের নাম 'নরম হৃদয়ের চিহ্ন'। এই ধরনের বিকল্প যৌনতার আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে উপন্যাসের সংরূপ নির্মাণ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। হিজড়া সমাজের কাহিনি নিয়ে কমল চক্রবর্তী লিখেছেন 'ব্রহ্ম ভার্গব পুরাণ' উপন্যাস। মিথ পুরাণ ও লোককথার আশ্রয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। যদিও এখানে পুরাণের অংশ সামান্যই। চাকরির সূত্রে কাগজের এডিটরে লেখক হিজড়ে সমাজের জন্ম, প্রেম, ভালোবাসা ও যন্ত্রণার অনুসন্ধান করেছেন। উপন্যাসে বিশিষ্ট চরিত্র রামভরোসা, যে সুস্থ পুরুষ হতে গিয়ে হিজড়েতে পরিণত

হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে হিজড়ে সম্পর্কে আমাদের মনের মধ্যে বেশ কিছু অসম্পূর্ণ ধারণা আছে। রূপান্তরকামী সফল অধ্যাপক মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় হিজড়েদের সম্পর্কে লিখেছেন :

> "অনেকেই মনে করেন হিজড়ে বোধহয় দু-প্রকার। পুরুষ হিজড়ে আর মহিলা হিজড়ে। প্রচলিত সমাজ নিজেদের ভাবনামতো, এমন সাজিয়ে নেয়। যে সকল হিজড়ের শরীরে পৌরুষ চিহ্ন বেশি তাদের মনে করে পুরুষ হিজড়ে, আর যারা অনেক বেশি মেয়েদের কাছাকাছি তারা মেয়ে হিজড়ে। হিজড়ে সমাজে সবাই সমান হিজড়ে। দুটি ভাগ শুধু এক জায়গায়, যেটি আমি আমার উপন্যাস 'অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা'-য় দেখিয়েছি—আকুয়া আর নির্বাণ। আকুয়া অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ (Penis & Testis) ছেদন করেনি। নির্বাণ তারা যারা পুরুষাঙ্গ Castration করে ফেলেছে বাস্তবিকই 'আকুয়া'-দের Testis থাকার কারণেই তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরণ হরমোণের প্রভাব থাকে, যার ফলে পৌরুষ চিহ্ন বিদ্যমান। আর যারা Testis বাদ দিয়ে দেয় শরীর থেকে তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরণ থাকে না বলেই মেয়েলি লাগে। আদপে দু-ধরনের হিজড়েই সমান হিজড়ে। আগের লেখায় বলেছি, কোনো বিশেষ মানসিক অবস্থার কারণে জৈবিক লিঙ্গে পুরুষ সামাজিক লিঙ্গে নারী হয়ে উঠতে চায়। হিজড়ে সমাজের এই গহিন মানসিকতার দিকটি লেখক পরিহার করে গেছেন বলেই, উপন্যাসে তিনি রামভরোসাকে পুরুষ হিজড়ে করে দেখাতে চেয়েছেন আর মির্চাকে দেখাতে চেয়েছেন মেয়ে হিজড়ে হিসেবে।"[৯]

ট্রান্সজেণ্ডার বা রূপান্তরকামী নারী রাজকুমার দাস স্বাভাবিক নারীর মতোই আজ যৌন মিলনে সক্ষম। সেক্সুয়াল আনন্দ, উত্তেজনা সেও অনুভব করে। 'পৌরুষ' উপন্যাসে সংসারবিচ্ছিন্না সখীসোনা বুঝতে পারেনি সে নারীত্বে ফিরতে পারবে কি না? লক্ষ্মণকে বিবাহ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে কি না? তবে আজ অনেক রূপান্তরিত নারীই বিবাহ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে চাইছে। হয়তো সন্তানের জন্ম দিতে তারা অপারগ। কারণ ট্রান্জিশনের পরেও গর্ভাশয় প্রতিস্থাপনের কোনো সার্জারি আজও বিজ্ঞান চালু করতে পারেনি। বিয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষিত সমাজে এক ধরনের উন্নাসিকতা আজও চালু আছে। তাই তাদের স্বনির্ভর হতেই হয়।

সামাজিক অবজ্ঞার কারণে নিজেদের রুটি রোজগার করতে গিয়ে ট্রান্সজেণ্ডারদের রীতিমতো কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ না পেলে এদের জন্য দু'-তিন রকম পেশা সমাজে খোলা থাকে:

প্রথমত, যৌনকর্মীর পেশা।
দ্বিতীয়ত, নাচগান বা বিনোদনমূলক জীবিকা।
তৃতীয়ত, পার্লারে মেক আপের পেশা।
চতুর্থত, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করা অথবা হিজড়ের পেশাগ্রহণ করা।

মনে রাখতে হবে, হিজড়ে কোনো যৌনশ্রেণি বা লৈঙ্গিকসত্তা নয়, এটা একটা প্রফেশন, একটা পরম্পরা। প্রত্যেক হিজড়েই ট্রান্সজেণ্ডার, কিন্তু প্রত্যেক ট্রান্সজেণ্ডার হিজড়ে হয় না। ট্রান্সজেণ্ডাররা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের জেন্ডার পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক থাকে। এমনকি নিজেদের পিতামাতার দেওয়া নামও বদল করে নেয়। রাজকুমার দাস নিজের সহজাত নামে সন্তুষ্ট থাকলেও বালুরঘাটের বাসিন্দা অনীক দত্ত অ্যানে দত্ততে, কিংবা, সৌম্যদীপ সৌমীয়া বসুতেই বেশি পরিতৃপ্তি অনুভব করে। হয়তো অস্ত্রোপচার করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এজন্য সামাজিক স্বীকৃতি যেমন মেলে না, অন্যদিকে ব্যয়বহুল এই চিকিৎসার আট থেকে দশ লাখ টাকা ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্যও সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এছাড়াও থাকে হরমোন ট্রিটমেন্টের নানা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। শরীর যদি না চিকিৎসার ঝুঁকি গ্রহণ করতে না পারে সেক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। অস্ত্রোপচার হোক বা না হোক, অন্তরে তারা পুরুষ বা নারীত্বের বোধ লালন করে থাকে। এমনকি, একগাল দাড়ি নিয়েও তারা নিজেদের নারী বলে মনে করতে পারে। এভাবেই অন্তর্মানসে তাদের জেন্ডার পরিবর্তিত হয়। সমসেক্সের প্রতি তারা আকর্ষণ বোধ করে। অনেক ট্রান্সজেণ্ডার আছে যারা পরিবর্তনের আগে বা পরে হিজড়ে সমাজে যায়। গুরুমায়ের হাতে-পায়ে ধরে সেই পেশাটাকে বেছে নেয়। এখানে একটা আশ্রয় এবং রুজি-রোজগারের সামাজিক নিরাপত্তা মেলে। যদিও সেখানে অনেক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়।

ট্রান্সজেণ্ডার কমিউনিটি আর হিজড়ে সমাজ তাই আলাদা। হিজড়েদের মধ্যে একটা পেশাগত দিক রয়েছে। যদিও ট্রান্সজেণ্ডার কমিউনিটির লোকেরাই সেখানে যায়। কারণ, এরা সমাজের মূলস্রোতে কোনো জায়গা পায় না। ২০১৮ সালের National Human Rights Commission এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ৯৮% ট্রান্সজেণ্ডার adolescent period এর আগেই বাড়িছাড়া হয়। অনেকক্ষেত্রে এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী চোরাপথে কিশোরদের অপহরণ করে নিয়ে আসে। নানা বেসরকারি নার্সিংহোমে তাদের পুরুষাঙ্গ ছিন্ন করে। এরা মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথামতো 'আকুয়া'-য় পরিণত হয়। এইভাবে খোজাকরণের পর তাদের হিজড়ে

পেশায় নামতে বাধ্য করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকার হিজড়েদের সমীক্ষা করতে গিয়ে একটা পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে 'ভারতের হিজড়ে সমাজ'[১০] গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে—

- ছিন্নী বা খোজা – ৫১%
- জেনানা বা পুরুষ - ২০%
- আকুয়া বা বিপরীত সাজসজ্জাকারী ও যৌন পরিবর্তনকারী – ১৭%
- ছিবড়ি বা মহিলা - ৭%
- জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী – ১০%

তবে সুখের কথা এই, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও ভারতের মতো দেশে এরা আজ অনেকটাই সুরক্ষিত। এখানে ট্রান্সজেণ্ডারদের জন্য ২০২০ সাল থেকে ন্যাশানাল অনলাইন পোর্টালের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যেখানে অনায়াসে একজন ট্রান্সজেণ্ডার নিজেই Apply করে ট্রান্সজেণ্ডার আই কার্ড, সার্টিফিকেট অনায়াসে বানাতে পারে। সরকারিভাবে ২০১৪ সাল থেকে তাদের সার্জারি ছাড়াই Gender Identity স্বীকার করা হয়েছে। ২০১৯ সালে এদের জন্য Protection of Rights Act চালু হয়েছে। তাদের বিবাহকেও আইনসিদ্ধ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি. আই চন্দ্রচূড় জানিয়েছেন[১১]:

> "A person is a transgender person by virtue of their gender identity. A transgender person may be heterosexual or homosexual or of any other sexuality. If a transgender person is in a heterosexual relationship and wishes to marry their partner (and if each of them meets the other requirements set out in the applicable law), such a marriage would be recognised by the laws governing marriage."

রূপান্তরকারীদের অনেকেই শিক্ষাগ্রহণে তৎপর হচ্ছে। তাদের শিক্ষা বা চাকরির জন্য সংরক্ষণ পদ্ধতি চালু হয়েছে। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যানে দত্ত, সৌমীয়া বসু, রাজকুমার দাসেরা আজ সরকারি চাকরির মাধ্যমে সামাজিক সম্মান আদায় করে নিয়েছে। সমাজে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি, আমরা পদাতিক, কোমলগান্ধার, আনন্দম্ ইত্যাদি একাধিক সংগঠন তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। বৃহন্নলার পেশায় নেমে নিজেদের কোণঠাসা করতে চাইছে না, বিভিন্ন চাকরিতে, স্বাধীন পেশায় তারা এগিয়ে আসছে। এমনকি সুস্থ সমাজে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের সামিল হয়ে তারাও বিবাহ করছে। সন্তান অ্যাডপ্ট করে তারাও মা হতে চায়। তাদের নিয়ে কথাসাহিত্যও আজ অনেকটা সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী লিখেছেন 'হলদে গোলাপ' উপন্যাস, তিলোত্তমা মজুমদার লিখেছেন 'তুবুল তুই' গল্প। চরিত্রের আবেগ, অনুভূতি তাদের অন্তরের নাবলতে পারা কথার বাণীরূপ হয়ে উঠছে কথাসাহিত্যের বিষয়। আর এভাবেই হুগলির জনাইয়ের মেয়ে শরণ্যা ঘোষ, যাকে নিয়ে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল সে কি পুরুষালি মেয়ে, না কি মেয়েলি পুরুষ? ২০২৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করে সে হয়ে উঠেছে এই সমাজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত তাচ্ছিল্য ও ভ্রূভঙ্গিমার বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। তার বাবা-মা তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার সমাজ তাকে আশ্রয় দিয়েছে। আর সে দেখিয়ে দিয়েছে নারী, পুরুষ ইত্যাদি কোনো লিঙ্গ বিভাজন নয়, সকলের মতো তারাও একজন হাত-পা –মাথাওয়ালা একটি সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ।

তথ্যসূত্র:

১। https://youtu.be/8pJa6syY2do?si=v9BePLzKfGRd4xdE

২। https://youtu.be/RZx63Tvm6Vs?si=-D7Qu-InQnpFq17D

৩। কবিতা সিংহ, 'পৌরুষ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৯। পৃ. ১৮১।

৪। ঐ, পৃ. ১৯১।

৫। ঐ, পৃ. ৮৭।

৬। ঐ, পৃ. ৮৭-৮৮)

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, চতুর্থ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১, পৃ. ১৬২।

৮। অজয় মজুমদার, নিলয় বসু, 'ভারতের হিজড়ে সমাজ', দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৬, চতুর্থ সংস্করণ, মে, ২০২৩, পৃ. ১২৮-১২৯)

৯। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয়সত্তা চিহ্ন', প্রতিভাস, কলকাতা-২, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ ১৭৭।

১০। ভারতের হিজড়ে সমাজ', পৃ ৫৩।

১১। https://www.thehindu.com/news/national/transgender-persons-in-heterosexual-relationships-have-the-right-to-marry-under-existing-law-supreme-court-holds/article67431749.ece।